আনিসুজ্জামান

পূর্বগামী

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উৎসর্গ

ভূঁইয়া ইকবাল
লায়লা জামান

মুখবন্ধ

পূর্বগামী অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের স্বল্প পরিচিত বইয়ের একটি। এখন থেকে প্রায় দুই যুগ আগে (২০০০) বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হয়েছিল; সম্ভবত সংস্করণটি ছিল সীমিত। ফলে পাঠকদের কাছে এটি ঠিকমতো পৌঁছেনি; এমনকি আনিসুজ্জামানের গ্রন্থগুলো যেসব স্থানে সংরক্ষিত আছে সেখানেও বইটি আমরা খুঁজে পাইনি। এই দুষ্প্রাপ্যতা দূর করতেই বর্তমান নতুন সংস্করণ।

আনিসুজ্জামান মূলত গবেষক ও প্রাবন্ধিক। ১৯৫০-এর দশকে তিনি কিছু ছোটোগল্প লিখেছিলেন; সঙ্গে কিছু কবিতাও। পরে কয়েকটি বিদেশি নাটকের রূপান্তর করেছিলেন। তবে প্রবন্ধই তাঁর মূলধারার রচনা। গবেষণাগ্রন্থের বাইরে আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধকে প্রধানত দুইভাবে বিভক্ত করা যায়—গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং সাময়িকপত্র/ সংবাদপত্রের প্রবন্ধ। *পূর্বগামী*-তে দুই রকমের প্রবন্ধই রয়েছে; তবে সাময়িকপত্র/ সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক।

পূর্বগামী-তে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ২৮। এর সবগুলোই ব্যক্তি এবং তাঁদের সৃষ্টিকে নিয়ে রচিত। স্রষ্টারা মূলত সাহিত্যের কারিগর; মাত্র একজন তাতে ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রচর্চা আনিসুজ্জামানের একটি প্রধান আগ্রহের বিষয়। এই বইয়ে অর্ধেক জুড়ে রয়েছেন তাঁর প্রিয় রবীন্দ্রনাথ। তাতে একদিকে রয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য ও সংগীতের জগৎ; অন্যদিকে

রয়েছে কবির সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা। চকিতে আমরা চিরায়ত রবীন্দ্র-আলোচনা থেকে বেরিয়ে যাই যখন বুদাপেস্টের একটি বাগানে রবীন্দ্র-রোপিত ফলের গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আনিসুজ্জামান অনুভব করেন—"ফুলের মতো তিনি সব দেশের, সব কালের"। অন্যদিকে 'রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা', 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম' বা 'রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে তুলে ধরেন রবীন্দ্রভাবনার নির্যাস। যেমন প্রথম প্রবন্ধে : "সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করে সম্রাট আকবর যে 'প্রেমে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা' করেছিলেন, তাঁর তুলনায় ইংরেজ শাসকের ধর্মনিরপেক্ষতাকে তাঁর মনে হয়েছে রাজনৈতিক কলাকৌশল মাত্র।" আবার রবীন্দ্র-আলোচনার সূত্রেই প্রবন্ধে উপস্থিত হন কবির তিন অগ্রজ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরকে এক সুতোয় বেঁধে প্রবন্ধকার নিয়ে এলেন কাদম্বরী দেবীকে। তারপর সেই চির পরিচিত প্রশ্ন—"কেন আত্মহত্যা করেছিলেন কাদম্বরী দেবী?"। উত্তরে নানা গসিপের উল্লেখ করে আনিসুজ্জামান তাঁর মধ্যে স্থিত থাকলেন না, চলে গেলেন প্রসঙ্গান্তরে—"কারণ যাই হোক, তাঁর আত্মহত্যা বড় রকম নাড়া দিয়ে গেল সকলকে।" এখানেই প্রবন্ধকারের পরিপক্বতা এবং মুনশিয়ানা।

পরিবারের বাইরে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরও দুজন কবি—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক বাঙালি মুসলমানদের একটি অতি আলোচিত বিষয়। এ বিষয়ে চর্চা যত হয়েছে, বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে তার থেকে বেশি। আনিসুজ্জামান রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন নিরেট তথ্যের আলোকে; প্রশ্ন তুলেছেন প্রচলিত অনেক গসিপ নিয়ে এবং খণ্ডন করেছেন অনেক বিভ্রান্তিকে। আনিসুজ্জামান মনে করিয়ে দিয়েছেন নজরুল দুজনের জীবিতকালেই রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : "তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, বিশ্বের বিস্ময়"। আর নজরুলকে যারা শুধু হুজুগের কবি বলে অবজ্ঞা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাদের উদ্দেশে বলেছেন : "....যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য"।

কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে দুটি পৃথক প্রবন্ধ আছে গ্রন্থে। এর একটিতে নজরুলের ওপর *শনিবারের চিঠি*-র আক্রমণের তথ্যগুলো অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। নজরুলের বিভিন্ন কবিতার প্যারডি রচনা করে সজনীকান্ত দাস যা লিখেছিলেন, তার বয়ান আছে এই প্রবন্ধে। অন্য প্রবন্ধে আনিসুজ্জামান নজরুলের প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন : "তিনি যা ইচ্ছে করেছিলেন, তাতে সফলকাম হয়েছিলেন—নজরুল কাব্য-প্রতিভার সবচেয়ে বড় গৌরব এখানে।"

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তীদের মধ্যে দুজনের ওপর আলোচনা আছে সংকলনে। এঁদের একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অন্যজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; তবে মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র অনুপস্থিত।

বাঙালি মুসলমানের ভাবজগৎ আনিসুজ্জামানের আগ্রহের আরও একটি বড় প্রান্ত। এই ভাবজগৎকে তিনি বারংবার অনুসন্ধান করেছেন বাঙালি মুসলমান লেখকদের জীবন ও সৃষ্টি এবং মুসলমান সম্পাদিত সাময়িকপত্রের পাতায়। *পূর্বগামী*-তে তিনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল, হবীবুল্লাহ বাহার, শওকত ওসমান, সুফিয়া কামাল, আহমদ শরীফ, আবদুল হক চৌধুরী ও শামসুর রাহমানের জীবন ও কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে আবুল ফজল, শওকত ওসমান, সুফিয়া কামাল, আহমদ শরীফ, শামসুর রাহমান ও মুর্তজা বশীর—এ ছয়জনের সম্পর্কে রচনাগুলো মূলত স্মৃতিকথা ও জীবনী।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় পথিকৃৎ। বাংলা পুথিসংগ্রহের পটভূমিতে তাঁর একটি বিশদ মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছে গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধে। এতে আনিসুজ্জামানের মূল্যায়ন, তাঁর "সংগ্রহের ফলেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহু অপরিজ্ঞাত কবি, অজ্ঞাতপূর্ব কাব্য ও অপরিচিত তথ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।" কাজী আবদুল ওদুদকে তিনি মনে করেন, "এক বিতর্কিত ভাব-আন্দোলনের কেন্দ্রীয় পুরুষ" এবং বাঙালি

মুসলমান সমাজে উদারতার বাণী প্রথম যারা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন, কাজী ওদুদ তাঁদের অগ্রণী। হবীবুল্লাহ বাহারকে আনিসুজ্জামান দেখেন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষের মঙ্গলকামনায় নিবেদিত এক প্রাণ। তবে স্মৃতিকথাতেও আনিসুজ্জামান নির্মোহ ও স্পষ্টবাদী। জিয়াউর রহমান মন্ত্রিসভায় উপদেষ্টা থাকাকালেই আবুল ফজল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 'মৃতের আত্মহত্যা' শীর্ষক একটি গল্প লেখেন। এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের অবলোকন : "অল্পকাল সরকারের মধ্যে থাকায় তাঁর বক্তব্যের প্রভাব আগের মতো ব্যাপক হতে পারেনি।"

পূর্বগামী-র প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময়ের রচনা। এগুলো মূলত প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাহিত্যপাতায়, কয়েকটি সাহিত্যপত্রে, আর কয়েকটি নানা স্মারকগ্রন্থে। এখানে সবচেয়ে পুরানো লেখা ১৯৫৭ সালের। হিসাব করলে দেখা যায়, এতে ৫০-এর দশকের একটি, ৬০-এর তিনটি এবং ৮০-র দশকের তিনটি লেখা রয়েছে। ৭০-এর দশকের কোনো রচনা এতে নেই। তবে অধিকাংশ রচনা ৯০-এর দশকের—সংখ্যায় ১৯টি। ফলে এর মধ্যে আনিসুজ্জামানের চিন্তাধারার বিবর্তনের একটি চিত্র পাওয়াও স্বাভাবিক। তবে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়েছে, প্রবন্ধগুলো পড়ে আমার তেমন মনে হয়নি। প্রায় অর্ধশতক ধরে (১৯৫৭-১৯৯৯) তিনি একই রকমের যুক্তিবাদী, উদার, প্রগতিশীল, তথ্যনির্ভর, বিশ্লেষণ-পটু ও পরিপক্ব। অথচ প্রথম প্রবন্ধটি যখন লিখছেন তখন তিনি সদ্য এমএ পাস করেছেন; শেষ প্রবন্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক। গ্রন্থটিতে যেসব তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে, তার অধিকাংশই স্বল্প-পরিচিত; অনেক তথ্য নতুন। কিছু তথ্য জেনে চমকে উঠতে হয়; প্রচলিত অনেক ধারণা তাতে ভেঙে যায়। তাঁর ভাষা সরল অথচ কাব্যিক, অনায়াসলব্ধ অথচ আকর্ষণীয়। ঘটনার বর্ণনায় তাঁর বাক্য এমনভাবে উপস্থাপিত হয়, পাঠক তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারেন না। মাঝেমধ্যেই ঝলক দিয়ে ওঠে তাঁর সহজাত wit ও humour। কিছু কিছু প্রবন্ধের শিরোনামও নজরকাড়া।

অভিধানগুলোতে *পূর্বগামী* শব্দের নানা অর্থ পাওয়া যায়। এর মধ্যে অগ্রগামী বা অগ্রপথিক অর্থে অথবা আগে যারা সম্মুখে গমন করেছেন—এই অর্থে সম্ভবত বইটির নামকরণ। আমাদের পূর্বসূরি সংস্কৃতির মানুষদের কথা জেনে আমরা যাতে ভবিষ্যতে ঠিক পথে চলতে পারি, এই ধারণাই নামকরণে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। সংস্কৃতির পূর্বগামীদের অনুসরণ করে একটি প্রগতিশীল যুক্তিনির্ভর উদার সমাজ গঠনের প্রয়োজন আজ নতুন করে দেখা দিয়েছে। সেখানেই *পূর্বগামী*-র গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
আগস্ট ২০২৪

সূচি

বিদ্যাসাগর	১৫
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-প্রসঙ্গে	২০
রবীন্দ্রনাথের তিন অগ্রজ	২৬
রবীন্দ্রনাথ	৪০
ভানুসিংহ	৪৯
'...জীবনের ধ্রুবতারা'	৫৪
রবীন্দ্রনাথের কবিতা, দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা	৫৯
রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য	৬৭
শুধু গীতাঞ্জলি নয়	৭৬
রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ে ভাবনা	৮১
রবীন্দ্রনাথের ধর্ম	৮৯
গণতান্ত্রিক চেতনা ও রবীন্দ্রনাথ	৯৩
রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা : একটি দিক	১০৪
ফুলের দেশের কবি	১৪৩
রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল : ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১৪৬
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও আমরা	১৫৩
নজরুল ইসলাম ও তাঁর কবিতা	১৫৯
কবির প্রতি শনির দৃষ্টি	১৬৯
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ	১৭৫
কাজী আবদুল ওদুদ	১৮৬
আবুল ফজল : স্মৃতিকথা	১৯৪
মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহার	১৯৯
শওকত ওসমান : জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য	২০৬
সুফিয়া কামাল : জন্মবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য	২০৯
আহমদ শরীফ স্মরণে	২১৪
আবদুল হক চৌধুরী	২২০
শামসুর রাহমানকে শুভেচ্ছা	২২৪
মুর্তজা বশীর : শিল্পী ও বন্ধু	২৩০
সংকলিত রচনার প্রথম প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্য	২৩৭

বিদ্যাসাগর

এবারের ২৯ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবার্ষিক। তাঁর মতো এত বড় মানুষ আমাদের দেশে খুব কম জন্মেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, চার কোটি বাঙালি গড়তে গড়তে বিশ্বকর্মা হঠাৎ একজন মানুষ গড়ে তুলেছিলেন। মধুসূদন তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন বাঙালি জননীর হৃদয়, ইংরেজ ভদ্রলোকের কর্মশক্তি এবং প্রাচীন ঋষির প্রতিভা ও জ্ঞান। সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়েছিলেন, সে-উপাধি আরো বহু জনে লাভ করেছিলেন। তবু বিদ্যাসাগর বলতে আজো তাঁকেই বোঝায়। ওই বিদ্যাসাগর উপাধির অনুকরণেই লোকে তাঁকে করুণাসাগর উপাধি দিয়েছিল, তাও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার।

যে-প্রাচীনপন্থী পরিবেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-পরিবেশের বিরুদ্ধেই তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মন ও মনন গড়ে উঠেছিল প্রায় সম্পূর্ণতই প্রাচ্য শিক্ষায়, ইংরেজি শিখেছিলেন তিনি বেশ পরে, সংস্কৃত কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরিতে ঢুকে। পুরুষানুক্রমে লাভ করেছিলেন অবর্ণনীয় দারিদ্র্য আর অদম্য মনোবল। যুক্তিতর্ক-বিচারবুদ্ধি-আত্মসম্মানবোধ কতটা পরিবারসূত্রে ও শিক্ষাসূত্রে লাভ করেছিলেন আর কতটা ছিল তাঁর সহজাত, তা বলা কঠিন। আমরা

শুধু এটুকু জানি যে, সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়েই ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যবিবাহের দোষ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছিলেন; ওই কলেজের যখন সহকারী সম্পাদক তখন সম্পাদকের সঙ্গে মতবিরোধের দরুন নিশ্চিত চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন; যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন ড. ব্যালানটাইনের প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচির বিরোধিতা করে শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছেন। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরে, তাঁর বিখ্যাত চটি পায়ে দিয়ে, ছোটোলাটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন, প্রহরীরা ঢুকতে দেয় নি বলে ফিরে এসে তিরস্কার করে চিঠি দিয়েছিলেন ছোটোলাটকে। চটি পায়ে মিউজিয়মে ঢোকা যাবে না বলে ঘোড়ার গাড়িতে নিজে বসে থেকে বন্ধুকে ভেতরে পাঠিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভেতরে নিয়ে যেতে চাইলে বলেছেন, সবার জন্যে এক নিয়ম তাঁর জন্যে আরেক নিয়ম, তিনি মানবেন না, সুতরাং জাদুঘরে ঢুকবেন না। সাহেবেরা জুতো-পায়ে মিউজিয়মের ভেতরে যেতে পারে অথচ বাঙালিরা চটি পায়ে যেতে পারে না কেন, পরে এ নিয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে দেশসুদ্ধ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে সভা করতে গিয়ে দেখেন, সাহেব টেবিলের ওপর সবুট দু পা তুলে পাইপ খাচ্ছেন, তাঁকে দেখেও পা নামান নি। পরের দফায় সভা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ তাঁর ঘরে ঢুকে দেখেন, বিদ্যাসাগর তালতলার চটি পরিয়ে ধূলিধূসরিত দু পা টেবিলে তুলে নারকেলের হুঁকো টানছেন। সাহেবকে বসতে বলছেন বটে, পা নামাচ্ছেন না। সাহেব নালিশ করলেন শিক্ষা-অধিকর্তাকে, বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন কর্তা। বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের কাছ থেকে সুসভ্য জাতির ভদ্রতা শিখে তিনি তার অনুকরণ করছিলেন মাত্র।

এই বিদ্যাসাগর যুক্তিবলে বুঝেছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা দরকার। তিনি বলছেন, আমাদের দেশে লোকে যুক্তি মানে না, শাস্ত্র মানে। তাই শাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে তিনি দেখালেন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।